এই সময়

* কথাসরিৎ *

আমাদের নিজের মাতৃভূমির পক্ষে— হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্ম— এই দুই মহান মতের সমন্বয়— বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ— একমাত্র আশা।

— স্বামী বিবেকানন্দ

অসফল

ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্র কেমন আছে? গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত কমনওয়েল্থ গেম্স-এ কিছু প্রতিযোগিতায় ভারতের ক্রীড়াবিদরা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি বিচারে পরিস্থিতিকে মোটেই বিশেষ আশা ব্যঞ্জক বলা যাচ্ছে না। জিমনাসটিক্স-এ মহিলা বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন দীপা কর্মকার। ডিসকাসে সোনা জিতেছেন বিকাশ গৌড়া। অন্য দিকে স্কোয়াশ ডবল্স-এ দেশের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক ঘরে এনেছেন দীপিকা পল্লিকল এবং জোশনা চিনাপ্পা এবং পি কাশ্যপের দক্ষতায় ৩২ বছর পরে কমনওয়েল্থ গেম্স-এ ব্যাডমিন্টনে সোনা জিতল ভারত। তাঁদের জন্যেই সারা দেশ গর্বিত। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতের মোট পদক জয়ের হিসাবটি দেখলেই সমস্যাটি অনুধাবন করা সম্ভব হবে। এ বছর ৬৪টি পদক জিতেছেন ভারতের প্রতিযোগীরা। এর মধ্যে আছে ১৫টি স্বর্ণপদক। বাস্তব এটাই যে ১৯৯৮ সালের পর কমনওয়েল্থ গেম্স-এর সব থেকে দুর্বল ফল। ২০১০ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েল্থ গেম্স-এ ভারত মোট ১০১টি পদক জিতেছিল, যার মধ্যে ছিল ৩৮টি সোনা। স্পষ্টতই বিগত চার বছরে ক্রীড়াক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে ভারত আসলে পশ্চাদাপসরণ করেছে। দিল্লির অভূতপূর্ব সাফল্যের পর দেশজুড়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে যে জোয়ারের আশা করা হয়েছিল তা মোটেই পূর্ণ হয়নি।

কেন এই ব্যর্থতা? কারণ একাধিক। ২০১০ সালে কমনওয়েল্থ গেম্স আয়োজন উপলক্ষে বিপুল অর্থ ব্যয় করে যে ক্রীড়া পরিকাঠামো নির্মিত হয়েছিল, ক্রীড়াবিদদের কাছে তার পূর্ণ সুযোগ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। জেলা স্তর থেকে উচ্চতম জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিভার সঠিক সনাক্তকরণের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের এই পরিকাঠামো ব্যবহার ও যথাযথ প্রশিক্ষণের সুযোগ না দিতে পারলে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতি অসম্ভব। এই বিপুল জনসংখ্যার দেশে প্রতিভার অভাব সমস্যা নয়, সমস্যা প্রতিভার বিকাশের সুযোগের। তা যাতে সম্ভব হয় ক্রীড়ানীতি সেই ভাবেই নির্ধারিত হওয়া জরুরি। এ ছাড়াও এ ক্ষেত্রে ভারতের ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ, ক্রীড়া প্রশাসনের ব্যর্থতা। এ দেশে ক্রীড়া প্রশাসনে যে পরিমাণ রাজনীতি ও দুর্নীতি দেখা যায় তা বিশ্বে বিরল। এর ফল ভুগতে হয় ক্রীড়াবিদদের। বক্সিং ফেডারেশনের প্রশাসকদের লজ্জাজনক আচরণের ফলে গ্লাসগো কমনওয়েল্থ গেম্স-এর প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ভারতের মুষ্টিযোদ্ধারা অংশগ্রহণই করতে পারেননি। তা ছাড়া বিভিন্ন খেলার সঙ্গে কোনও ভাবেই যুক্ত থাকার কোনও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও নিতান্তই রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে ক্রীড়া প্রশাসনের উচ্চতম পদগুলি দখল করে থাকলে একটি দেশের ক্রীড়া-ব্যবস্থার যা পরিণতি হতে পারে ভারতের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রকে অবিলম্বে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা ছাড়া এ সমস্যার আর কোনও সমাধান নেই। সমস্যা হল কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে প্রায় সব রাজনৈতিক দলই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রীড়া প্রশাসনের দখল নিতে উৎসাহী। কাজেই এ জন্য প্রয়োজন নাগরিক সমাজের সচেতনতা ও উদ্যোগ।

পরিচয়

ভারত কমনওয়েল্থ গেম্স-এ খান পনেরো সোনা জিতল, পদক তালিকায় সবার মধ্যে পাঁচ। যদিও আগের থেকে ফল খারাপ, তা সত্ত্বেও এখন উদযাপন ক্ষণ। তা চলছে চলুক, ভালোই তো। এমনিতেই ক্রিকেটের দুরমুশ করে দেওয়া দাপটে, অন্য কোনও কিছু নিয়েই তো কথা ওঠে না, কমনওয়েল্থ-এ ভালো ফল করার সবাদে যেটুক আলো

ভোটে হিন্দুত্বের থেকে মোদীত্ব সফলতর তাই অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরএসএস নীরব?

আগের এনডিএ জমানার মতো অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ নয়, আরএসএস-এর লক্ষ্য এখন শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করা। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের জয় দেশের রাজনীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। কেবল একটি বুথফেরত সমীক্ষাকে (সি ভোটার চাণক্য) বাদ দিলে বহু বুথফেরত সমীক্ষা এনডিএ জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সম্ভাবনা দেখালেও ভারতীয় জনতা পার্টি যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে চলেছে তা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত দেয়নি। অনেক বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফলকে নস্যাৎ করে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি একক ভাবেই লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। গত ১৪ মে এই লেখক এই সংবাদপত্রেই বুথফেরত সমীক্ষাগুলোর পর্যালোচনা করার সময় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের বিপুল জয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। উক্ত সন্দেহ যে অচিরেই ভুল প্রমাণ হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি একক ভাবে ২৮২টি আসন পেয়েছে (সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে ১০টি আসন বেশি) ও এনডিএ জোট ৩৩৬টি আসন পেয়েছে। ভোটের বিচারে বিজেপি মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেয়েছে ও এনডিএ জোট ৩৮ শতাংশের উপর ভোট পেয়েছে। এই ভোট যদিও ৫০ শতাংশের অনেক কম কিন্তু ভারতীয় লোকসভার বহুদলীয় নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ, গত আড়াই দশকের লোকসভা নির্বাচনে বারংবার বহুবিভাজিত ফলাফল দেখা গিয়েছে। তাই যাঁরা বিজেপি-র সাম্প্রদায়িক ও জনবিরোধী রাজনীতির স্রেফ নৈতিক নিন্দায় আটকে আছেন; তাঁদের ভেবে দেখা দরকার যে বিজেপি-র নতুন 'ব্র্যান্ড মোদী'-র রাজনৈতিক অভিনবত্ব কোথায়।

১৯৯৮ ও ১৯৯৯-২০০৪ সময়কালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের পূর্বতন সরকারের থেকে আজকের নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু গুণগত পার্থক্য আছে। বিজেপিকে কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচ বছর স্থায়ী ভাবে চালাতে গেলে তাকে অন্য কারও সাহায্য দরকার হবে না। এনডিএ জোটের অন্যান্য সঙ্গীরা এই সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিলেও বিজেপি-র নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের কিছু যায় আসে না। কিন্তু এই এনডিএ জোটের মোদীর মতো এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ ও কর্তৃত্ববাদী নেতার পিছনে দাঁড়ানোর কারণগুলো ভিন্ন। এখানেই ১৯৯০-এর দশকের পূর্বতন এনডিএ সরকারের থেকে মোদীর নেতৃত্বাধীন আজকের কেন্দ্রীয় সরকারের পার্থক্য।

পূর্বতন এনডিএ সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির হিন্দুত্ববাদী ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি। কিন্তু সেই হিন্দু জাতীয়তবাদী এজেন্ডা বিজেপিকে একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতাও জোগাড় করতে সাহায্য করেনি। সেই দিক থেকে হিন্দুত্বের পরিবর্তে মোদীত্ব অনেক বেশি সফল। বিজেপিকে আজ যে কোনও নির্বাচন লড়তে গেলে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দাবি আর আলাদা করে বলতে হয় না। হিন্দুত্ব আজ বিজেপির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। কিন্তু মোদীত্ব হল হিন্দুত্বের সঙ্গে বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজির একচেটিয়া পূর্ণ সমর্থন, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, জাতিকেন্দ্রিক রাজনীতি ও উন্নয়নের ঢাক পেটানো এমন একটা মডেল যা একই সঙ্গে গরিব ও ধনীর স্বার্থরক্ষার কথা বলে। সেই জন্য মোদী গরিব ও দলিত-বহুজন মানুষকে এই বলে মন জয় করার চেষ্টা করেন যে, তিনিও পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর আগে একই সাথে তিলি (অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি) ও চা-বিক্রেতা। অন্য দিকে, মোদীর ডান হাত অমিত শাহ যিনি গুজরাটে মন্ত্রী থাকাকালীন একটি ভুয়ো সংঘর্ষের মামলায় সিবিআই-য়ের জালে জড়িয়েছিলেন এবং তিন মাস পুলিশ হাজতে ছিলেন— তিনি এখন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হয়েছেন। এই অমিত শাহ-র বিরুদ্ধেই আবার ২০১৩ সালে মুজফ্ফরনগর দাঙ্গা সংগঠিত করার অভিযোগ আছে। সেই দাঙ্গায় ৫০ হাজারের উপর মানুষ ঘরছাড়া।

সে ক্ষেত্রে, মোদীত্ব একটি ভিন্ন রকমের জনমোহিনী রাজনীতি। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, মোদীত্ব হল হিন্দুত্ববাদী জনমোহিনী রাজনীতি যা আরএসএস, বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজি ও শহুরে মধ্যবিত্ত, এবং দলিত-বহুজন ও গরিব মানুষের একাংশের সমর্থনে পুষ্ট। নয়ের দশকে বিজেপি-র ব্রাহ্মণ-বানিয়া জোটের থেকে মোদীত্বের সামাজিক ভিত্তি এখানেই আলাদা। লোকসভা ভোট জেতার পরে মোদী তাঁর প্রথম বক্তব্যে মানুষকে বলেছিলেন, 'ভালো সময় এসে গিয়েছে' (আচ্ছে দিন আ গয়ে হ্যায়)। মানুষের আঙুলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কালি মুছতে না মুছতেই মোদী সাহেব তেতো ওষুধের কথা বলতে শুরু করেছেন। সেই তেতো ওষুধের স্বাদ পাওয়া গেল রেলের পণ্য মাশুল বাড়িয়ে, রেলভাড়া বাড়িয়ে, পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে। অথচ তিনিই নির্বাচনের আগে হুংকার দিয়েছিলেন মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে। কাজেই মোদীত্বের আরেক নাম রাজনৈতিক ভণ্ডামি। অন্য দিকে, পূর্বতন এনডিএ সরকারের সময় সমষ্টিগত নেতৃত্বের যে নজির ছিল (বাজপেয়ি, আদবানি, যোশি, যশবন্ত সিং, যশবন্ত সিনহা, বেঙ্কাইয়া নাইডু) তা আজ বিজেপিতে প্রায় বিলুপ্ত। মোদী একই সঙ্গে দল ও সরকারের সর্বেসর্বা। তিনি যা চাইবেন সরকারকে তাই করতে হবে। আর তিনি যা চাইবেন না তা তাঁর দক্ষিণ হস্ত অমিত শাহ দলের ভিতরে হতে দেবেন না। অন্য দিকে, অর্থনৈতিক নীতিগুলো প্রণয়নের ক্ষেত্রে আরএসএস-র ভূমিকা আগের থেকে অনেক ম্রিয়মাণ। পূর্বতন এনডিএ সরকারের সময় গোবিন্দাচার্য ও তাঁর অনুগামীরা অর্থনীতিতে স্বদেশি ভাবধারার কথা বলতেন। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা মোটেই মানা হয়নি। আজ কিন্তু সে রকম অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের কথা বিজেপির পক্ষ থেকে আর কেউ বলে না। মোদীর আমলে বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে অর্থনৈতিক নীতি উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের আগ্রাসী মডেল দ্বারা চালিত।

> মোদীত্ব একটি ভিন্ন রকমের হিন্দুত্ববাদী জনমোহিনী রাজনীতি যা আরএসএস, বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজি ও শহুরে মধ্যবিত্ত, এবং দলিত-বহুজন ও গরিব মানুষের একাংশের সমর্থনে পুষ্ট।

তাহলে মোদীর আমলে আরএসএস-র ভূমিকা কী? আরএসএস আজ আর্থিক বিষয়গুলোতে মত না দিয়ে তারা কেবল শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে নিজেদের বিভিন্ন কার্যকলাপ চালাচ্ছে। যেমন, কন্নড় ভাষার খ্যাতনামা লেখক ইউ আর অনন্তমূর্তির বাড়িতে ফোনে হুমকি দেওয়া হয় যে, তিনি যেন অবিলম্বে ভারত ছেড়ে পাকিস্তান চলে যান কারণ, তিনি প্রকাশ্যেই মোদীর বিরোধিতা করেছিলেন। অন্য দিকে, আরএসএস-র মতাদর্শে দীক্ষিত 'শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি'-র নেতা শ্রী দিনানাথ বাটরা এখন বিভিন্ন ঐতিহাসিক বইগুলো যাতে আর ছাপা না হয় তার ব্যবস্থা করছেন। তাঁর দাখিল করা মামলার ভয়ে ওয়েন্ডি ডনিগার-এর বই 'দ্য হিন্দুজ: অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রি' আর প্রকাশক বাজারে বিক্রি করে না। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'প্লাসি টু পার্টিশন: আ হিস্ট্রি অফ মডার্ন ইন্ডিয়া'-র বিরুদ্ধে শ্রী বাটরা অভিযোগ করেন যে, এই বই আরএসএস-র প্রতি অসম্মানসূচক ও সম্মানহানিকর। এইসব কীর্তি-কলাপের ফলে ঐতিহাসিক মেঘা কুমারের বই 'কমিউনালিজম অ্যান্ড সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স: আমেদাবাদ সিন্স ১৯৬৯' যা কিনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখিকার ডি ফিল থিসিস ছিল তা প্রকাশক আর প্রকাশ করলেন না। পুণের এক চব্বিশ বছর বয়সী তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে প্রাণ দিতে হল এক দল হিন্দুত্ববাদী হামলাকারীদের হাতে। মহসিন শেখ নামক এই যুবকের মৃত্যু আর এক বার আমাদের চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল যে, নরেন্দ্র মোদী যতই সুদিনের কথা বলুন না কেন, তা ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের কাছে আজও দুরস্ত। ফেসবুকে শিবাজি ও বাল ঠাকরের সম্মানহানিকর কিছু ছবি নিয়ে যে বিতর্ক মহারাষ্ট্রের কিছু এলাকায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল, তারই জেরে এক মুসলমান তরুণকে প্রাণ দিতে হল। কারণ, তাঁর বাহ্যিক চেহারায় ধর্মীয় পরিচিতিটি সুস্পষ্ট ছিল। মোদীসাহেব আগের প্রধানমন্ত্রীকে বরাবরই নিশ্চুপ থাকার জন্য তিরস্কার করেছেন। এই ঘটনাগুলির আবহে তাঁর হিরণ্ময় নীরবতাটিও তাৎপর্যপূর্ণ। আরএসএস-এর আস্থাভাজন সুদর্শন রাওকে সম্প্রতি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টোরিকাল রিসার্চ-এর প্রধান করা হয়েছে। এই সংস্থার পূর্বতন প্রধান ছিলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য। এই সংস্থার বহু প্রাক্তন প্রধান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ যাঁদের মৌলিক গবেষণা ভারতীয় ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক নতুন দিক উন্মোচিত করেছে। সুদর্শন রাও-এর ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে কী ধরনের মৌলিক অবদান আছে, তা এখনও অজানা। কেবল জানা যায় যে তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের মতো উচ্চমার্গের সাহিত্যকে প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে দেখেন। গুজরাটে ২০০২ সালে যখন দাঙ্গা চলছিল, তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি নরেন্দ্র মোদীকে রাজধর্ম পালনের উপদেশ দিয়েছিলেন। উপরের ঘটনাগুলি থেকে স্পষ্ট যে, 'পার্সোনালিটি কাল্ট'-নির্ভর মোদীত্বের দাম্ভিক রাজনীতি আজও সেই উপদেশ মানতে নারাজ।

মোদীত্বের এহেন গতি-প্রকৃতি মূলত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলোতে আপাতত অনেক বেশি করে লক্ষ করা যাচ্ছে। আসাম বাদ দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও মোদীত্বের তেমন প্রভাব নেই। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে বিজেপি-র ভোট বাড়লেও পঙ্কজ (বিজেপি-র নির্বাচনী চিহ্ন) আজও কম ফুটেছে দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গে। কিন্তু আগামী দিনগুলিতে তার সম্ভাবনা কতটা? সে এক অন্য বিশ্লেষণ।

লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক